MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০২৩
দাম : দশ টাকা

ভারতের ক্রমাগত পানি প্রত্যাহার–
তিস্তা এবং উত্তরবঙ্গ কী বাঁচবে?

পানির স্বাভাবিক গতি এবং গন্তব্য নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন কি আছে? এর স্বাভাবিক উত্তর হবে, এটা তো সবাই জানে পানি উপর থেকে নিচে প্রবাহিত হয় এবং নদী সৃষ্টির মাধ্যমে সাগরে গিয়ে মেশে। এর কোন সীমানা নেই, দেশের নাম পাল্টায়, সীমানা পাল্টায় কিন্তু পানি বয়ে চলে সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই। নদী বয়ে চলে উজান থেকে ভাটির দিকে। এই যে বিষয়টি এত স্বাভাবিক সেই ব্যাপারটা নিয়ে অস্বাভাবিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে কেন? একটু খোলাসা করে বলা যাক! ভারত বাংলাদেশের উজানে, সেখান থেকে পানি গড়িয়ে যাবে সমুদ্রে, মাঝখানে পড়েছে বাংলাদেশের ভূখণ্ড। বাংলাদেশের উজানের ১৫ গুণ বেশি অঞ্চল জুড়ে যে বৃষ্টিপাত হয় এবং হিমালয় থেকে বরফ গলে যে পানি আসে তা বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রের পানে। প্রাকৃতিক এই নিয়মকে রাজনৈতিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে বাংলাদেশের উজানের দেশ ভারত। শুধু নৈতিকভাবে নয় আন্তর্জাতিক সকল বিধিবিধানকেও তোয়াক্কা করছে না তাঁরা। একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীকে আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়ে থাকে। সেই বিবেচনায় ভারত থেকে বয়ে আসা ৫৪টি নদীই আন্তর্জাতিক নদী। কিন্তু ভারত সেগুলোর উপর এক বা একাধিক বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সহজভাবে কঠিন কথাটা হলো, ভারত বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত করছে এবং করেই চলেছে।

তিস্তার উজানে ভারত ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সীমান্তের ৬০ কিলোমিটার উজানে ৫৪টি ফটক বিশিষ্ট গজলডোবা বাঁধ নির্মাণ করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো ভারতীয় অংশে সেচের সম্প্রসারণ ঘটানো। এই বাঁধ দিয়ে প্রথম পর্যায়েই প্রায় ১০ লাখ হেক্টর, অর্থাৎ ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় সেচ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল করেছে তাঁরা। এসব খাল একদিকে পশ্চিম-দক্ষিণে অগ্রসর পশ্চিমবঙ্গের মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যন্ড় পৌঁছেছে; অন্যদিকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা পর্যন্ত গেছে। অর্থাৎ, গজলডোবা বাঁধ একটি বিস্তৃত পরিধিতে সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে এর ফটক বন্ধ থাকে বলে বাংলাদেশ পানি পায় না। এখন যে নতুন দুটি খাল খনন করা হচ্ছে, তা এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নের অংশ।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয়, পদ্মার উজানে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে পানি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভাগীরথী নদীতে। যার ফলে পদ্মা হারিয়েছে তার স্বাভাবিক প্রবাহ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে বিরোধ এবং তর্ক চলছেই। কিন্তু এই ফারাক্কা দিয়ে পানি অপসারণের একটি উচ্চ সীমা আছে, যার থেকে বেশি পানি নিতে পারবে না। এই সীমাটা হলো ৪০ হাজার কিউসেক। সে কারণেই যে ফিডার ক্যানেল দিয়ে গঙ্গার পানি ভাগীরথী নদীতে নেওয়া হয় তার সক্ষমতা এভাবেই নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু গজলডোবার বাঁধের মাধ্যমে ভারত কর্তৃক তিস্তার পানি অপসারনের কোনো উচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই। ফলে ভারত ভাটির দেশের কথা কোনভাবেই বিবেচনায় না নিয়ে নতুন নতুন খাল খননের মাধ্যমে তিস্তা নদীর পানি অপসারণের ক্ষমতা বাড়িয়েই চলেছে। আর বাংলাদেশ অঞ্চলে তিস্তা হারাচ্ছে তার বেঁচে থাকার মতো পানি। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের ব্যাপারে আলোচনা হয় যে, তিস্তার পানির ৩৯ শতাংশ পাবে ভারত, ৩৬ শতাংশ পাবে বাংলাদেশ আর ২৫ ভাগ পানি থাকবে তিস্তার নিজের জন্য। তিস্তা নিজে না বাঁচলে তার অববাহিকার জীব বৈচিত্র্য বাঁচবে কীভাবে? এর পর ২০০৭ সালে স্থির করা হয় ৪০ শতাংশ ভারত, ৪০ শতাংশ বাংলাদেশ এবং ২০ শতাংশ রাখা হবে নদীর জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু চুক্তি না হওয়ায় গজলডোবা থেকে শুষ্ক মৌসুমে তিস্তায় পানি আসার পরিমাণ শূন্য। ২০০-৩০০ কিউসেক পানি যা আসে তা গজলডোবার ভাটির উপনদী থেকে।

এ যাবতকালে তিস্তার উজানে ভারতের অনেক বাঁধ নির্মাণ করেছে, এবং ভবিষ্যতেও করবে। ভারতের একজন প্রখ্যাত গবেষক গৌরী নুলকার দেখিয়েছেন যে, তিস্তার উজানে এবং এর বিভিন্ন উপনদীর ওপর ভারত আরও প্রায় ১৫টি বাঁধ কিংবা ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এখনই তিস্তার প্রবাহ যা দাঁড়িয়েছে তারপ এগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ অংশে শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার কোনো প্রবাহ যে অবশিষ্ট থাকবে না, তা একরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এই ভয়াবহ বিপদকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এসব পরিকল্পনার বিরোধিতা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী। অংশীদার এবং ভাটির অংশের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সম্মতি ভিন্ন এই আন্তর্জাতিক নদীর ওপর এ ধরনের হস্তক্ষেপ ভারত করতে পারে না। নদীকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইতিমধ্যেই গজলডোবা বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে তিস্তা নদীর প্রবাহ শুধু যে 'ন্যূনতম পরিবেশসম্মত প্রবাহে'র নিচে চলে গিয়েছে তাই নয় জীবন্ত সত্তা হিসেবে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

ভারতের সাথে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন চুক্তি করার পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য জরুরি বিষয় হলো জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদ-নদীসংক্রান্ত ১৯৯৭ সালের সনদে (কনভেনশনে) স্বাক্ষর করা। কারণ এই সনদে আন্তর্জাতিক নদ-নদীর প্রতি অংশীদারী দেশগুলোর আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত নীতিমালা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এতে স্বাক্ষর করলে এবং অন্যান্য দেশগুলকেও স্বাক্ষর করতে উদ্বুদ্ধ করলে শুধু ভারত বাংলাদেশ নয়, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তানসহ উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে নদ-নদী সম্পর্কে বিরাজমান বিভিন্ন মতপার্থক্য নিরসনের সর্বসম্মত এবং আন্তর্জাতিক ভিত্তি সৃষ্টি হবে। অভিন্ন নদীর পানি পাওয়া এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভাটির দেশের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ এই সনদে স্বীকৃত হয়েছে। ফলে এই সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় এই সনদে স্বীকৃত অধিকারগুলো আরও জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে পারবে। আজকের যুগে যে কোন রাষ্ট্র তার সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রত্যাশা করে। ফলে অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দেখাতে পারবে যে তার দাবি যৌক্তিক এবং এতে আন্তর্জাতিক কনভেনশনের সমর্থন রয়েছে। সাথে সাথে বাংলাদেশ নদ-নদীবিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তার দাবিগুলো তুলে ধরে দেখাতে পারবে যে তার দাবিগুলোর ভিত্তি অনুরোধ বা সদিচ্ছা নয় তা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারাও স্বীকৃত। এসব জানা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজও কেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদীসংক্রান্ত ১৯৯৭ সালের সনদে (কনভেনশনে) স্বাক্ষর করেনি, তা মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না। উজানের দেশ হিসেবে ভারত সুবিধাজনক স্থানে আছে ফলে ভারতের গরজ নাও থাকতে পারে। কিন্তু ভারত স্বাক্ষর না করলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করবে না কেন? উজানের দেশ স্বাক্ষর না করলে ভাটির দেশ স্বাক্ষর করতে পারবে না এমন কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলে তো জানা নেই।

বাংলাদেশের নদ-নদী কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। অন্যান্য নদ-নদী ও জলাধারগুলোর সঙ্গে এগুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু প্রকল্প গ্রহণের সময় নদ-নদী ও জলাধারগুলোর এই পরস্পর সম্পর্কের বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। যেমন, ব্রহ্মপুত্র ডান তীর বাঁধ প্রকল্পের প্রসারণ হিসেবে তিস্তা নদীর ডান তীর ধরে কাউনিয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এর ফলে বহু শাখা নদী থেকে তিস্তা নদী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার পরবর্তীতে তিস্তা সেচ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের জন্য খাল খনন করা হয়েছিল। ফলে পূর্ব থেকে রয়ে যাওয়া যে অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা তিস্তা অববাহিকায় ছিল, সেগুলোকে অবহেলিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে।

যেমন, বাংলাদেশের ভেতর তিস্তার ডান তীরে ৭টি এবং বাম তীরে ৫টি শাখা এবং উপনদী আছে। এগুলোর সঙ্গে তিস্তা নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এগুলোকে সংযুক্ত করা হলে তিস্তার বর্ষাকালের প্রবাহ এসব নদী-নালা, খাল দিয়ে সারা অববাহিকায় বিস্তৃত হতে পারবে। শুষ্ক মৌসুমে এই সঞ্চিত পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে এবং ফিরতি প্রবাহের মাধ্যমে তা তিস্তা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারবে। সুতরাং ভারতের কাছ থেকে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের পাশাপাশি বর্ষাকালের পানি ধরে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিমধ্যেই তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের আওতায় আরও দুটি খাল খননের জন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ প্রায় ১ হাজার একর পরিমাণ জমির মালিকানা পেয়েছে। জলপাইগুড়ির জেলা প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে সেচ বিভাগকে জমির মালিকানা হস্তান্তর করে। এ জমির মাধ্যমে তিস্তার পূর্ব তীরে দুটি খাল তৈরি করতে পারবে প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলা দিয়ে বয়ে যাওয়া আরেক নদী জলঢাকার পানিপ্রবাহও খালের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সেচ বিভাগের এক সূত্রের বরাত দিয়ে টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়, তিস্তা এবং জলঢাকার পানি টানার জন্য কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি খাল খনন করা হবে। আরেকটি খালের দৈর্ঘ্য হবে ১৫ কিলোমিটার। এটি তিস্তার বাম পাশের তীরবর্তী এলাকায় খনন করা হবে। এই খালটি খনন করা হলে প্রায় এক লাখ কৃষক সেচসুবিধার আওতায় আসবেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ পদক্ষেপের আওতায় জলপাইগুড়ি ও কোচ বিহার এলাকার আরও অনেক কৃষিজমি সেচের আওতায় আসবে। সাধারণভাবেই বলা যায় যে তিস্তার পানি বাংলাদেশে না এসে চলে যাবে জলপাইগুড়ি ও কোচ বিহার এলাকায়। তাহলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ পানি পাবে কীভাবে?

ইতিমধ্যে তিস্তা নিয়ে নানা ধরনের
প্রকল্পের কথা শোনা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার চীনের পাওয়ার চায়না কোম্পানির মাধ্যমে পরিকল্পিত, অর্থায়িত এবং বাস্তবায়িতব্য 'তিস্তা নদী সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্পের কথা বেশ আলোচিত হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকে এটাকে সংক্ষেপে 'তিস্তা মহা-পরিকল্পনা' বলে অভিহিত করছেন। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এই পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে এ প্রকল্পের অনুমিত বাজেট প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা থাকলেও সরকারি মহল থেকে এখনও কিছু বলা হয়নি। এ ধরনের একটি জনগুরুত্বসম্পন্ন এবং ব্যয়বহুল প্রকল্প সম্পর্কে সরকার জনগণকে কোনো কিছু জানানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে বলে মনে হয় না। ধারণা করা যায় মুষ্টিমেয় কিছু কর্তাব্যক্তি ছাড়া সরকারের অভ্যন্তরের বাকি লোকজনও এ বিষয়ে তেমন অবহিত নন। এত বড় একটা প্রকল্প যা জনগণের অর্থে নির্মিত হবে এবং কয়েক কোটি মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করবে সে প্রকল্প সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রবণতা দুঃখজনক। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ সরকার তার জনগণকে প্রকল্প বিষয়ে কিছু না জানালেও পাওয়ার চায়না কোম্পানি ইউটিউবে ভিডিওর মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরছে।

যেহেতু সরকার এ প্রকল্প সম্পর্কে কোনো তথ্য গণ-পরিমণ্ডলে প্রকাশ করেনি, সেহেতু এই প্রকল্প নিয়ে কোন বিশ্লেষণধর্মী মন্তব্য বা মূল্যায়ন করা কঠিন বলে পানি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। উৎসাহী সাংবাদিকেরা এই প্রকল্পের পিডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্পসংক্রান্ত প্রাথমিক প্রস্তাবনা) এবং আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু পাওয়ার চায়না বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করেছে কিনা এবং করে থাকলে তা এখনো পাওয়া যায়নি। যাহোক, উৎসাহী গবেষকেরা এ প্রকল্পের পিডিপিপি এবং পাওয়ার চায়নার ভিডিওতে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে যে সব

বিশ্লেষণ উপস্থিত করছে তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। কোন প্রকল্প নিয়ে উৎসাহিত হওয়া বা বিরোধিতা করার আগে ভালোমত জানাটা খুবই দরকার।

যতটুকু জানা যাচ্ছে, এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, তিস্তা নদীর গড় প্রশস্ততা বর্তমান প্রায় ৩ কিলোমিটার থেকে ০.৮ কিলোমিটার (অর্থাৎ, এক-তৃতীয়াংশে) কমানো এবং বৃহৎ খননকাজের (ক্যাপিটাল ড্রেজিং) মাধ্যমে গড় গভীরতা ৫ মিটার থেকে ১০ মিটার করা। পাওয়ার চায়নার মতে, এটি হলে নদীগর্ভ থেকে ১৭১ বর্গকিলোমিটার ভূমি উদ্ধার করা হবে এবং তা শিল্প, উন্নত কৃষি, শহর-নির্মাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। ওই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে তিস্তার গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে নদীতে বেশি পানি থাকবে এবং তা শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা নানা দিক থেকে বিষয়টা দেখতে চাইবেন। কারণ তিস্তা নদী দিয়ে এখন বছরে গড়পরতা ৪ দশমিক ৯ কোটি টন পলি (মূলত বর্ষাকালে) প্রবাহিত হয়। ফলে খননের মাধ্যমে নদীর যে গভীরতা বৃদ্ধি পাবে, তা আবারও পলি দিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। ফলে কয়েকবছরের মধ্যেই বর্ধিত গভীরতা কমে যাবে। আর বর্ষায় বিপুল পানি এক-তৃতীয়াংশে সরুকৃত নদী ধারণ করতে পারবে না। ফলে নদী-তীরবর্তী বাঁধ ভেঙে আগের প্রশস্ততায় ফিরে আসতে পারে। কাজেই এই আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তিস্তার গভীরতা বৃদ্ধি এবং প্রশস্ততার হ্রাস কোনোটাই স্থায়ী হবে না।

ভারত কর্তৃক শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রত্যাহার আর বর্ষায় পানি ছেড়ে দেয়ার এই খেলা তো চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ তিস্তা ব্যারাজ। উত্তরবঙ্গে ৯ লাখ ২২ হাজার হেক্টর কৃষিজমিকে সেচের আওতায় আনতে ১৯৭৫ সালে তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পটি শুরু হয়। এর আওতায় খালের মাধ্যমে তিস্তার পানি নদীর দুই পাড়ের এলাকার কৃষিজমিতে সরবরাহের পরিকল্পনা হয়। ওই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া অন্য নদীগুলো থেকে খালে পানি সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের পানি আগ্রাসনের ফলে কয়েক দশক ধরেই প্রকল্পটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। প্রকল্পের সুফল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে কারণ বর্তমানে মাত্র ১ লাখ হেক্টরের মতো কৃষিজমিতে পানি পৌঁছাতে পারে। ফলে ভারতের এই ভূমিকার কারণে তিস্তা পরিকল্পনাও হুমকির মুখে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা, ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহার। ২০১৪ সালে ভারত যখন তিস্তা থেকে পানি প্রত্যাহার শুরু করে, তখনই বাংলাদেশের নদী আন্দোলনকারীরা বলেছিল, ভারতের এ উদ্যোগ দ্রুত বন্ধ করতে হবে। এর জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে ব্যর্থ হলে ভারত ক্রমান্বয়ে উজানের সব নদীর পানি প্রত্যাহারের পথে অগ্রসর হবে। কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে মরুকরণের আশঙ্কা দেখা দেবে। গত কয়েক বছরে সেই আশঙ্কাই যেন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

২০১৪ সালে তিস্তার পানি একতরফা প্রত্যাহারের যতটা প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন ছিল, ততটা হয়নি। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এবং কয়েকটি বামপন্থি দল প্রতিবাদ করেছিল। বাসদ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে তিস্তা ব্যারাজ অভিমুখী লংমার্চ পরিচালনা করেছে। এতে ব্যাপক জনসমর্থন থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তিস্তার পানি যেভাবে চাওয়া হয়েছে, সেটি মনে হয়েছে দুর্বল চাওয়া। আবার ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ প্রণীত পানিপ্রবাহ কনভেনশনে বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেনি।

উজানের দেশ হিসেবে ভারত সুবিধাজনক স্থানে থাকায় ভারত ওই আইন চায় না। কিন্তু বাংলাদেশের তো জীবন-মরণ সমস্যা, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ভঙ্গ করায় বাংলাদেশ ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিকার দাবি করতে পারত। তিস্তার পানি উজানে আটকে রাখার কারণে আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, জলবায়ুর অভিঘাত বাড়ছে। সবকিছু মিলিয়ে অর্থনীতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের যে ক্ষতির মুখে পড়ছে বাংলাদেশ, নিয়ম অনুযায়ী এর সব কটির জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার সুযোগ আছে। তিস্তা বাঁচাতে এবং উত্তরবঙ্গ বাঁচাতে এখন প্রয়োজন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা।

সিকিমের ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় জন্ম নেয়া তিস্তা ৪১৪ কিলোমিটার পার হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে মিশেছে। তিস্তা সিকিমের বৃহত্তম নদী, পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম নদী। এর ১১০ কিলোমিটার বাংলাদেশে অবস্থিত হলেও ১২৫০০ বর্গকিলোমিটার অববাহিকার জনবসতি ও কৃষি অধ্যুষিত বৃহত্তম অঞ্চলটাই বাংলাদেশে। ফলে পানির প্রয়োজন, হিস্যা এবং অধিকার বাংলাদেশের বেশি। বাংলাদেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করে ভারতের একতরফা পানি নেয়ার কারণে শুধু তিস্তা নয় বাংলাদেশের খাদ্য ভাণ্ডার বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গ বিশেষত রংপুর অঞ্চল কি শুকিয়ে মরবে? এই পরিনতি দেখতে না চাইলে প্রতিবাদের পথে নামা দরকার সকলের।

তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন

তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে ১৯ মার্চ '২৩ বগুড়ার সাতমাথায় বিভাগীয় সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ বগুড়া জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জয়পুরহাট জেলা আহ্বায়ক অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, সিরাজগঞ্জ জেলা আহ্বায়ক নব কুমার কর্মকার, নওগাঁ জেলা আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন মুকুল, রজশাহী জেলা আহ্বায়ক আলফাজ হোসেন, নাটোর জেলা সদস্যসচিব কমরেড মোবারক আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, মানব দেহের শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে থাকা নদী ও পলি দিয়ে গঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আজ পানির অভাবে মরুকরণের হুমকির মুখে। এই অভাব প্রাকৃতিক কারণে নয়, মানুষের সৃষ্টি। চীন, নেপাল, ভুটান ও ভারত থেকে আসা নদীগুলো বাংলাদেশে প্রবেশ করে জালের মতো ছড়িয়ে গেছে। এই নদীগুলোই বাংলাদেশের প্রাণ প্রবাহ। কিন্তু আন্তর্জাতিক সমস্ত আইন ও নীতি লঙ্ঘন করে ভারত ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে একতরফা পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার আগ্রাসী তৎপরতার ফলে পানির প্রবাহ কমে

গিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দেশের অভ্যন্তরে নদী দখল ও দূষণ। এক সময় দেশে ১ হাজার ২০০টি নদী ছিল। সরকারসমূহের ভ্রান্তনীতি ও দখল-দূষণের কারণে নদী মরে গিয়ে এখন ২৩০-এ নেমে এসেছে। খরা মৌসুমে বেশিরভাগ নদীতেই পানি থাকে না। একসময়ের প্রমত্তা অনেক নদীই এখন খাল-নালায় পরিণত হয়েছে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ভারত সরকার আন্তর্জাতিক নীতি লংঘন করে ভাটির দেশ বাংলাদেশের ন্যূনতম স্বার্থ বিবেচনা না করে একের পর এক নদীর পানি প্রত্যাহার করছে। বাসদসহ বিভিন্ন বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলসমূহের পক্ষ থেকে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। কারণ শাসকরা জনগণের উপর নির্ভর না করে আগামীতে ক্ষমতায় থাকার ভারতের শুভদৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যে কারণে তাদের কাছে দেশর স্বার্থ, জনগণ, নদ-নদী ও প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ কোন কিছুই গুরুত্ব পায় না। তাই তিস্তা বাঁচাতে, নদী রক্ষায়, পানি ও প্রাণ-প্রকৃতি বাঁচাতে সকল বাম প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, পরিবেশ ও নাগরিক আন্দোলনের প্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি ভারতের পানি আগ্রাসন, নদী দুষণ ও দখলদারদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রংপুর

২০ মার্চ বাসদের উদ্যোগে রংপুরে বিভাগীয় সমাবেশ স্থানীয় শাপলা চত্বরে জেলা আহবায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের পর তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবির প্লাকার্ড-ফেস্টুন, লাল পতাকা সজ্জিত মিছিল শাপলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে নগরের

প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাচারি বাজারে সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, কমরেড সাইফুল ইসলাম পল্টু, বাসদ গাইবান্ধা জেলার আহ্বায়ক গোলাম রব্বানী, দিনাজপুর জেলার আহ্বায়ক কিবরিয়া হোসেন, কুড়িগ্রাম জেলার আহ্বায়ক ফুলবর রহমান, নীলফামারী জেলার সমন্বয়ক ইউনুস আলী, সমাবেশ পরিচালনা করেন রংপুর জেলা বাসদের সদস্যসচিব মমিনুল ইসলাম।